টেকসই উন্নয়নে নারী শিক্ষা

সেলিনা আক্তার

আমাদের রয়েছে এক ঐতিহ্যবাহী অতীত ও এক সংগ্রামী বর্তমান, নারী সেখানে বিজয়া ও অগ্রগামী পথিক। ব্রিটিশ আমল থেকে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম যেমন- ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেধা, সাহসিকতা তথা অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে নারীর অসামান্য অবদান, অনুকরণীয়, বরণীয় এবং অবিস্মরণীয়। সব ধরনের জড়তা, কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনচেতা ও একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে নারীরা নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

নারী সমাজকে উন্নয়নের তথা ক্ষমতায়নের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কোনোভাবেই সমাজের পরিবর্তন সম্ভব নয়। নারীর অসীম শক্তি সম্ভাবনা, বিকাশের পথ সহজ হবে তখনই যখন উন্নয়নের মূলধারায় তার প্রাপ্য অধিকারটুকু বাস্তবায়িত হবে। নারীর প্রতিভা, গঠনমূলক চিন্তা, নৈতিকতা, যোগ্যতা, মানবিকতা, সামাজিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারীর অপার সম্ভাবনার বিকাশ সাধিত হবে।

নারী শিক্ষাকে নারীদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রদত্ত এক ধরনের জ্ঞান হিসেবে গণ্য করা হয়। এ জ্ঞান আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার আকারে হতে পারে। অর্থাৎ নারী শিক্ষা হলো নারীদেরকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা। তাই যে শিক্ষার মাধ্যমে নারীদেরকে শিক্ষিত করা ও তাদেরকে জীবন বিকাশের সহায়তা করা হয় তাকে বলা হয় নারী শিক্ষা।

যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশি উন্নত একথা আমরা সকলেই জানি। এছাড়া উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতিতে নারী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা নেপোলিয়নের উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় - আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব। বিশ্ব নেপোলিয়নের এই উক্তির মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেই বলেই বর্তমানে নারী শিক্ষার হার বেড়েছে। কারণ, একজন মেয়েকে শিক্ষা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা। বৃহদার্থে সমাজ ও দেশকে উন্নত করা। তাই জাতির কল্যাণ অগ্রগতিতে নারী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। নারী শিক্ষা ও উন্নয়ন পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। কেননা প্রকৃত উন্নয়ন বাস্তবায়ন করতে হলে সমাজের সার্বিক কার্যক্রমে দেশের নারী জনশক্তির অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। পূর্বে নারী শিক্ষা গ্রহণকে অলাভজনকভাবে দেখা হতো। মেয়েদের লেখাপড়া করাতে খরচ হবে, বিয়ে দেওয়ার ও খরচ আছে - এসবের জন্যে পূর্বে কন্যা শিশুর শিক্ষার প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। বর্তমানে মেয়ে শিশুদের বিষয়ে আলাদা দৃষ্টি দেওয়ার কারণে স্কুলে তাদের ঝরে পড়ার সংখ্যা এখন খুবই সামান্য।

সমাজের মধ্যে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধ মনোভাব ধারণকারী থাকলেও চারপাশে একাগ্র আওয়াজে অপশক্তি নীরব অথবা মানিয়ে নিচ্ছে সমানাধিকারের তেজ। শিক্ষার তাৎপর্য সূর্যের মতো আলোকিত করে সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করে দেয় ন্যায়ের পথ, অধিকারের বিস্তৃত পরিসর। আর দাবিয়ে রাখার বিরুদ্ধে একযোগে গেয়ে ওঠে কোরাস। যেখানে পরস্পর সহযোগী, বেঁচে থাকার অপূর্ব বন্ধনে জোরালো পদক্ষেপ মননে শক্তির উত্তাপ ছড়িয়ে ডেকে নিয়ে যায় সবুজ-শ্যামল প্রান্তরে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমাজ বিনির্মাণ ও সামাজিক সাম্যের নিশ্চয়তা বিধানে চিন্তাভাবনা কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির সমতা প্রয়োজন। প্রয়োজন পরস্পরের সহযোগিতা গ্রহণ করা এবং স্বীকৃতি। শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে এ মানসিকতা জাগ্রত হয়। সমাজে দীর্ঘদিনের লালিত একপেশে মনোভাব অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। পরিবার, সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে নারী-পুরুষ পরিচয়ের ব্যবধান হ্রাস করে সবার ব্যক্তিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নারীশিক্ষা মূল ভূমিকা পালন করে। কারণ সমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের রূপরেখা পরিবারে নারী বিশেষ করে মায়ের মধ্য দিয়ে সন্তানের দিকে প্রভাবিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে – 'আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা – যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা হইবে।' সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে- 'রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য; কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' এছাড়াও সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে- 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।'

বর্তমানে নারীরা বাংলাদেশের মোট লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। নারীদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে দেশ বা জাতির কখনো অগ্রগতি হতে পারে না। তাই জাতিকে সামনের দিকে যেতে হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও বিদ্বান করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সমাজে নারীর প্রধান পরিচয় সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনকারী জননী হলেও রাষ্ট্রসংক্রান্ত যেমন রাজনীতি,

অর্থনীতি কিংবা ব্যবসার ক্ষেত্রে নারীরা আজ জরুরি ও তাৎপর্যবহ ভূমিকা রাখছে। পুরুষের সঙ্গে নারী কল-কারখানায়, অফিস-আদালতে, মাঠ-ঘাটে কাজ করছে।আর এ কারণেই নারীশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

অনাধুনিক যুগে নারীরা সবকিছুর জন্য তাদের স্বামীদের মুখাপেক্ষী ছিল। তারা সেসময় সমাজ-সংসারে উপেক্ষিত ও উৎপীড়িত ছিল। ঘরের ভেতরেই তাদের বিধেয় ও অবিধেয় সব কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এ সময়ের নারীরা শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, পুলিশ অফিসারসহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করছে। নারীরা আজ পুরোপুরি আত্মনির্ভর। কাজেই নারীদের আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার কোনো সুযোগ নেই। কমবেশি সবাই অবগত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ঘরকন্নার কাজেও নারীশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সরকার নারী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বিনামূল্যে লেখাপড়ার সুযোগের পাশাপাশি উপবৃত্তি দিচ্ছে। কারণ, শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা নারীর সার্বিক উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং শিশু মৃত্যুর হার কমানোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ অনুসারে বাংলাদেশে বর্তমানে নারী সাক্ষরতার হার ৭৫ দশমিক ৮ শতাংশ; যা পুরুষ সাক্ষরতার চেয়ে ৪ শতাংশ কম। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশে প্রতি ১ শতাংশ নারীর উচ্চ শিক্ষা প্রবেশ বৃদ্ধি পেলে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) ০.৩৭ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রর্যায়ে নারী শিক্ষার হার ৪৭ শতাংশ যা বিগত দশকে ২০ শতাংশের নিচে ছিল।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা নারীকে পেছনে রাখার সুযোগ নেই। নারী মুক্তি ও নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য অবসর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘে "নারীর বিরুদ্ধে প্রচলিত সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ" সনদে স্বাক্ষর করেছ। দেশের উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ এবং অবদান এখন দৃশ্যমান। উন্নত বিশ্বের নারীদের মতো বাংলাদেশের নারীরাও শিক্ষা ও যোগ্যতা বলে নিজ নিজ অবস্থানে অবদান রেখে যাচ্ছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে নজর দিলেই এর প্রমাণ মেলে। দেশের প্রতিটি কর্ম ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ দেশের উন্নয়নকে বেগবান করেছে।

নারীর উন্নয়ন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান অবদান রাখতে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা ও কাজ করে যাচ্ছে। এ কারণেই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দেশেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এক সময় নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতো না কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হতো। সামর্থ্য থাকার পরও আমাদের জনশক্তি কাজে লাগানোর সুযোগ ছিল না, অব্যবহৃত থাকতো বিপুল জনশক্তি। শিক্ষার অভাবে আমাদের নারী সমাজ পিছিয়ে ছিল অনেক দূর। নারীদের অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগতে আনার জন্য বেগম রোকেয়া আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রচেষ্টার সফলতা দেখে যেতে পারেননি। আজ নারীদের অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার হার বেড়েছে। দেশের সর্বক্ষেত্রে নারীর সরব উপস্থিতি সমাজ ও দেশের অর্থনীতিকে বদলে দিয়েছে। নারীরা এখন দেশের অর্থনীতির জন্য বুঝা নয়, সম্পদ। আজ দেশে এমন কোন সেক্টর নেই, যেখানে নারীদের অবদান নেই। চাকরি ক্ষেত্রে কোটার বাইরেও মেধার প্রতিযোগিতায় মেয়েরা পেছনে ফেলেছে ছেলেদের। কর্মক্ষেত্রে নারীর কর্মনিষ্ঠা সবার কাছে প্রশংসিত। বাংলাদেশের রপ্তানির প্রধান খাত তৈরি পোশাক। উন্নত বিশ্বে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বিপুল চাহিদা রয়েছে। এই শিল্পের প্রধান কারিগর নারী। প্রতিবছর বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ মার্কিন ডলার আয় করে তৈরি পোশাক রপ্তানি করেই। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো অংশ এই শিল্পে নিয়োজিত। তারা নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের পাশাপাশি দারিদ্র্যমোচনের ভূমিকা রাখছেন।

কর্মক্ষেত্রের সব পর্যায়েই নারীর অবদান সবার দৃষ্টি কেড়েছে। এক সময় এনজিওতে নারীরা কাজ করলেও মানুষ বাঁকা চোখে তাকাতো। আজ তারাই মেয়েদের কাজ করতে উৎসাহিত করেছে। দক্ষতার সঙ্গে নারীরা সফলভাবে ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা করে যাচ্ছেন।দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে নারী।নারীরা এখন বিদেশে গিয়ে কাজ করে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই নারী-কর্মীদের বিপরীত চাহিদা রয়েছে। জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম এক কোটির বেশি জনশক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কর্মরত নারীকর্মীদের আগ্রহের কারণে বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। নারীরা যাতে প্রতারিত না হয়,হয়রানি শিকার না হয় সেজন্যে তাদের সহায়তা ও বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে,আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বিদেশে বাংলাদেশে নারী কর্মীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। দেশে বিদেশে কর্মক্ষেত্রে নারী তাদের দক্ষতা, মেধা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। নারী উদ্যোক্তারা এখন ব্যবসাবাণিজ্যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন বাংলাদেশে। এসএমই লোনসহ নারী ব্যবসায়ীদের জন্য সরকার বিশেষ সুযোগ সুবিধা অনেক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণেই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন নারী উদ্যোক্তারা। নারীদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এখন দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশে বেশ জনপ্রিয়।দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও নারী ব্যবসায়ীদের অবদান অনেক।ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে রপ্তানি হচ্ছে। নারীঘন এ শিল্প এখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। বিপুল সংখ্যক গ্রামের নারী এখন জাতীয় উৎপাদনে অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছেন। আর্থসামাজিক উন্নতি হচ্ছে দ্রুত গতিতে।

নারীদের সুরক্ষা সরকার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। বাল্য বিয়ের হার কমেছে। কাজ করে কম মজুরি দেওয়া বা নারীদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার সুযোগ আর নেই। তবুও হিংস্র পশুরূপী মানুষ দ্বারা নির্যাতন হলেও তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগের কারণে প্রতিবাদের হার বেড়েছে। থানায় নারী ও শিশু ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতনবিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে এখন এ ধরনের অপরাধপ্রবণতা কমে এসেছে। কোনো ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার বিচার হচ্ছে এটি একটি সভ্য সমাজের জন্য খুবই জরুরি। নারীর কাজের পরিবেশ, মূল্যায়ন ও উৎসাহ অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের নারীরা অনেক এগিয়ে যাবে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার নতুন মাত্রা যুক্ত করবে। আর সেজন্যে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নারী -পুরুষকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যেতে হবে, কাজ করতে হবে একসঙ্গে।

নারীর শিক্ষা শুধু তার ব্যক্তিগত বিকাশের উপায় নয়, এটি পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। একটি শিক্ষিত মা শুধু নিজে স্বাবলম্বী হন না, বরং তিনি সন্তানদের সঠিক মূল্যবোধ, চিন্তাশক্তি ও মানবিক গুণাবলিতে গড়ে তোলেন। ফলে নারী শিক্ষার প্রভাব বহুগুণে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। একটি শিক্ষিত নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ পরিবার ও সমাজকে করে আরও সুসংহত ও সচেতন। তাই নারী শিক্ষাকে পরিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। এই প্রযুক্তিনির্ভর যুগে পিছিয়ে থাকা নারীদের এগিয়ে নিতে হলে তাদেরকে তথ্যপ্রযুক্তি, বিজ্ঞান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। নারীরা যাতে শুধু প্রথাগত শিক্ষা নয়, বরং উদ্ভাবনী চিন্তা ও আধুনিক দক্ষতায়ও সমানভাবে দক্ষ হয়, সে লক্ষ্যে নীতিনির্ধারকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একইসঙ্গে পরিবার ও সমাজকেও মানসিকতা বদলে নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তাহলেই গড়ে উঠবে একটি জ্ঞাননির্ভর, সমৃদ্ধ, ও টেকসই বাংলাদেশ।

#

পিআইডি ফিচার